মাধুরীর ছাতা

বাসুদেব দেব

এক

কলকাতায় কাক, শালিখ আর চড়ুই ছাড়াও কোনও পাখি আছে নাকি? শুভব্রত তেতলার জানলা দিয়ে দেখতে পায় রাস্তার ওপাশে কচি মিপাতার মধ্যে দুপুরের রোদে একটা অচেনা পাখি। লেজটা সবুজ, মেরুন রঙের ঝুঁটি আর পালকগুলোতে নানা রঙের বাহার। কোনও কাজ নেই তাই খই ভাজার মতো প্রকৃতি প্রেক্ষণ। আবার কখন উড়ে গেল পাখিটা। এবার আরও দূরে চোখ চলে যায়। একটা ঘুড়ি, লাল রঙের ঘুড়ি উড়ছে আকাশে। আষাঢ় শে। বৃষ্টি নেই। অনেকদিন এরকম পাখি গাছপালা ঘুড়ি দেখা হয়ে ওঠে না শুভব্রতর। এসময়ে ছুটির দিন ছাড়া বানি থাকার কথাও নয় তার। আর অন্যদিন তে ব্যস্ত থাকতে হয়, বাইরে কোথাও বেনাতে না গেলে প্রকৃতির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ঘটে না। বেশ কদিন ধরে শুভ একা থাকছে এই ফ্ল্যাটে, এ সময়ে। একা ঠিক নয়, তাকে দেখাশোনার জন্য একজন আয়া বা সেবিকা আছে এখন, তার নাম মল্লিকা। শুভব্রতর জ্বর। আজ একুশ দিন হলো। জ্বর ছাড়ছে না। নাছোড়বান্দা। বাড়ে, কমে, একইরকম থাকে, ঘাম হয়, মুখ তেতো, বিস্বাদ, মাথা ধরে থাকে, জ্বর ছাড়ে না। অনেক বড় বড় এলোপ্যাথি ডাক্তার দেখানো হয়েছে। পরীক্ষা নিরীক্ষাও কম হয়নি। নার্সিং হোমেও চারদিন থেকে যাবতীয় টেস্ট করা হয়েছে। কেউ কিছু ধরতে পারছে না। টাউফয়েড নয়, নিউমোনিয়া নয়, যক্ষ্মা, ক্যান্সার বলেও মনে হচ্ছে না। এইচ আই ভি তো কিছু মেলেনি। ব্রেন, লাংস, হার্ট, কিডনি, লিবার এ বয়সে যেমন থাকার কথা সেরকমটাই মনে হচ্ছে রিপোর্টের বান্ডিলে। এক্সরে, আল্টাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান থেকে কী করা হয়নি! জলের মতো গুচ্ছের টাকা বেরিয়ে গেছে। অফিস থেকে খরচের পুরোটা পাবার ভরসা নেই। নাম করা হোমিওপ্যাথ ডঃ ঘোষমণ্ডলের চিকিৎসাও চলেছে, বিপিন সেন কবিরাজ মহাইয়ের ব্যবস্থাও পালন করা গেছে। বালিশের তলায় কে যেন কালীবাড়ির আশীর্বাদী ফুলও রেখে গেছে, বোধহয় বড় পৌদি। শুভব্রতর দাদা দেবব্রত সবে অবসর নিয়েছেন। শুভ'র এখনও তিনবছর বাকি। ছোটভাই সুব্রত থাকে ভুবনেশ্বরে। সেও দেখে গেছে। মাধুরী, মানে শুভ'র স্ত্রী সোদপুরে একটা ইস্কুলে পড়ায়। প্রথম দিকে ছুটি নিয়ে সে-ই সব করেছে। ইস্কুলে পরীক্ষা চলছে। আর কদিনই বা ছুটি নেবে? জ্বর তো, সাংঘাতিক কিছু নয়। তবু ছাড়াছে না বলে সবাই চিন্তিত। কোত্থেকে কী হয়, কে বলতে পারে? ডাক্তাররা তো বলেন, জ্বর কোন অসুখ নয়, অন্য কোনও অসুখের উপসর্গ। ভাইরাল না অন্য কিছু কোনও পরীক্ষাতেই ধরা পড়েনি। এমনকি সুবীর সেনের মতো বাঘা ডাক্তারও বল্লেন সব দেখে, খাওয়া দাওয়া নর্মাল, ঠাণ্ডা জলে স্নান করুন। বিশ্রাম নিন। সেরে যাবে। প্রেসার সুগার প্রভৃতি ইত্যাদি দেখা হয়েছে বারে বারে, রক্ত থুতু বমি পেচ্ছাপ, সবই। মাঝখানে একদিন অফিসেও গিয়েছিল ট্যাক্সি করে। ডালহৌসি, এখন অবিশ্যি বিবাদী বাগ এলাকায় তার অভিস। ডিরেক্টর প্রবীর বসু বললেন, জড়ুর গায়ে কেন অফিস করছেন? ছোঁয়াচে কিনা কেউ জানে না। বাইরে কত রকম জার্ম। ফাইলের মধ্যেও কত না! ছুটিতেই থাকুন, মেডিকেল লিভ নিন। অগত্যা শুভব্রতর এখন ছুটি। কাগজে বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু কতরকম ছোঁয়াচে অসুখের কথা লেখে, সে সবও ডাক্তার ত্রিপাঠি চেক করে নিয়েছেন। এক কথায় ডাক্তাররা এবং শুভব্রতর এখন ছুটি। কাগজে বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু কতরকম ছোঁয়াচে অসুখের কথা লেখে, সে সবও ডাক্তার ত্রিপাঠি চেক করে নিয়েছেন। এক কথায় ডাক্তাররা এবং শভব্রত ও মাধুরী হাল ছেড়ে দিয়েছে। জেনারেল কন্ডিসনে এলার্মিং কিছু নেই। ইত্যাদি।

দুপুর বেলা তাই খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় দাঁড়ানো এবং পরে বিছানায় গা ঢেলে দেওয়া। মাঝেমধ্যে থার্মোমিটার লাগানো। বেঙ্গালুরু থেকে মেয়ের ফোন কখনও, বাপি, জ্বর ছাড়লো? তিয়াসার উদ্বেগ। এম বি এ পড়তে গেছে বছর কানেক হলো।

ঘুড়িটা উড়ছে। ঘুড়ি মানেই ছেলেবেলা মানে জলঙ্গি নদীর পাড়ে, হিরুদের আমবাগানে, মাঠে ঘুরে বেড়ানো বিকেল, বন্ধুদের সঙ্গে। ঘুড়ি পিছনে ছুটতে গিয়ে একবার পড়ে গিয়েছিল শুভ খেয়াঘাটের কাছে। কপালে সেই দাগটার ওপর হাত বুলোয়। আদর করে তার ছেলেবেলার দিনগুলোকে। মনে পড়ে যায় বাবা-মার কথা। কতকাল বুলে থেকেছে। সে। তাঁর ছবি হয়ে আছেন এখন। কিন্তু জ্বর তার ছাড়ছে না। কেন? স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারছে না কতদিন ধরে। অক্ষম রাগ আর বিতৃষ্ণা। এ সবই নির্ঘাৎ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফল। বিশ্ব উষ্ণায়ন। ঋতু বিপর্যয়। আষাঢ় মাস। বৃষ্টি নেই। ওদিকে আয়লার সাইক্লোনে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বিপর্যস্ত। হিমবাহ গলছে। প্লাবন। খরা আর বন্যা। মানুষের সম্পর্কের মধ্যেই যত সব শীতলতা। ডুবে যাচ্ছে নাকি, ছোট ছোট দ্বীপ। পৃথিবীর জ্বর বাড়ছে প্রতিদিন। এই টিভি ফ্রিজ গাড়ি কলকারখানা ধোঁয়া এমনকি এত মানুষের নিঃশ্বাস... এসবই নাকি জ্বর বাড়িয়ে দিচ্ছে। মরে যাচ্ছে অনেক প্রজাতি। নানারকম নতুন অসুখ হচ্ছে। কোন এক পত্রিকাতেই পড়েছে সে। একি সেরকম কোনও অসুখ? নতুন ধরনের কোনও হিসেব বহির্ভূত জীবাণু যা ধরা পড়ছেনা বিজ্ঞানীদের যন্ত্রে। ভাবুক প্রকৃতির নয় কখনও শুভ, কবি বা গাইয়ে স্বভাবের নয়, রাজনীতিও করে না মাঝেমধ্যে কথাবার্তার খাতিরে হালের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে যেমন নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, লালগড়, শিল্প, কৃষি, দলাদলি বা ছাব্বিশে নভেম্বরে মুম্বইয়ের তাজ হোটেলের সন্ত্রাস হানা, কাসভের স্বীকারোক্তি, ধর্মঘট-বন্ধ, প্রশাসনের আমরা তোমরা, বিদ্বজ্জনদের বিভাজিত বিজ্ঞাপিত অভিযান ইত্যাদি বিষয়ে আলটপকা দুটো একটা চলনসই মন্তব্য।

ঘুড়িটা আর দেখা যাচ্ছে না। কাটা পড়লো নাকি? এই যে নাম - না - জানা নাছোড়বান্দা জ্বর, এটাও কি শুভ'র ঘুড়িটা কেটে দেবে এবার? মৃত্যুর থেকে বড় সন্ত্রাস আর কি? প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তার সন্ত্রাস জারি আছে। ফৌজ পাঠিয়ে লড়াই তো কম করা হচ্ছে না। বিছানায় যাবার আগে এক গ্লাস জল খাবে বলে টেবিলের দিকে এগোয়। সেখানে ছোটখাট কে ডিসপেনসারি যেন। ওষুধে ওষুধে ছয়লাপ। জলের গ্লাসের ঢাকা সরাতে গিয়ে বারান্দায় চোখ পড়ে— আশ্চর্য, একটা রূপালি মই কখন নেমে এসেছে সেখানে। টবের টগর গাছের পাশেই। আকাশে ঝকঝকে মেঘ। আষাঢ় মাসে এরকম হবার কথা নয়। মইটা যেন ডাকছে তাকে। মই বেয়ে এই তিনতলার বারান্দা থেকে কোথায় যাবে সে? জলটা খেয়ে ফেলে বিপুল তৃষ্ণায়। ওকি, মই বেয়ে নেমে আসছে একটা সাদা বেড়াল।

এ বাড়িতে কোনও বেড়াল তো ছিল না। বেনালটা আসল্য ভাঙলো। রাজকীয় ভঙ্গিতে লেজ দুলিয়ে চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে দেখতে থাকলো শুভ্রব্রতর ঘরদোর সংসার। শুভর ঘাম হতে থাকে। গলা দিয়ে আচমকা গুলির মতো চিৎকার ছিটকে াসে : মল্লিকা, মল্লিকা...

দুই

—না, মেসোমশাই কোথাও তো কোনও বেড়াল নেই। —বারান্দায় নেই? —না তো। খাটের নীচে, বাথরুমে, রান্নাঘরে দেখেছ তো ভালো করে?— দেখেছি। ও আপনার মনের ভুল। শুয়ে পড়ুন। ওষুধ দিচ্ছি। — কোন মই টই নেই বারান্দায়? —মই ? না তো, তারে কেবল মাসিমার শাড়িটা শুকোচ্ছে। —ও, শুভব্রতর খটকা লাগে। দৃষ্টিবিভ্রম শুরু হলো, এই কদিনের জ্বরে? একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরতে লাগলো, সে চোখ বুজে শুয়ে থাকে। তন্দ্রা মতো আচ্ছন্নতা, জ্বর জ্বরভাব, টুকরো টুকরো পুরোনো কথা...। আজ না হয় জ্বর হয়ে শুয়ে বসে ঘর বন্দি হয়ে কাটাচ্ছে, এতকাল কী করেছে সে, কোনও রাজকার্য? ভাবতে গেলে কোনও উত্তর মেলে না। খাওয়া দাওয়া ঘুম অফিস বাজার ঘর গেরস্থালি মাধুরীর সঙ্গে সহবাস, তিয়াসাকে বড় করে তোলে, ফ্ল্যাট কেনা... আর সবাই যা করে, করে যাচ্ছে, একই কাজ, পুনঃপৌনিকতার মামুলি গল্প। জ্বরটা তাকে নিয়ে খেলছে এখন, সেও খেলছে জ্বরটা নিয়ে। যেমন করে মাছ খেলে বড়শি নিয়ে, বড়শিওলা খেলে মাছ নিয়ে। এই চারদিকের আসবাব, বইপত্র, দেয়ালসজ্জা, আলমারি, ফ্রিজ টিভি, ওয়াশিং মেশিন, বেশ সুন্দর জালটি ঘিরেছে তাকে। ঠাওর হয়নি এতকাল। আজ কিছুটা হচ্ছে। শুয়ে বসে একলায়, জ্বরে। আর ওই বেড়ালটা? বইটা...

কলিং বেল বেজে ওঠে। তন্দ্রার রেশ ছিঁড়ে যায়। মল্লিকা দরজা খোলে। মাধুরীর ফেরার সময় তো হয়নি, তবে? —মেসোমশাই। এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বলে দিই, আপনার জ্বর। পরে আসবেন। —নাম কি? মল্লিকা ড্রইং রম থেকে ফিরে এসে বলে— অতুলানন্দ সরকার। কেশনগর থেকে নাকি এয়েছেন— বসতে বলো। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। গেঞ্জির ওপর একটা ফতুয়া পরে নেয় শুভব্রত। অতুলকে রদেখে তো অবাক। চিনে আসতে পারলি? —তোর অফিসে তো কয়েকবার গেছি। কদিন আগে একবার গেলাম, তোর খোঁজ করতে বললো, তোর নাকি জ্বর বেশ কিছুদিন। তা ভাবলাম দেখে যাই। তা তোর কী হয়েছে? নিজের অসুখের কথা সাতকাহন করে কতবার কত লোককে আর বলা যায়। অতুল কেশনগরের বন্ধু, সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে। মাধমিকের পর আর এগোয় নি। শহরতলির শেষে ওদের বসত বাড়ি। একটা মুদি - কাম - মনোহারি জিনিসের দোকান। বছরে দু-একবার কলকাতা আসে কেনাকাটা করার জন্য বা ভৈরবঠাকুরের আশ্রমে কাজে। তখন শুভব্রতর অফিসে দেখা করে গেছে কয়েকবার। বিয়ে থা করেনি। ল্যাংড়া, ছেলেবেলার পোলিও। জলঙ্গি নদীর ধারে একটা দেবোত্তর পোড়ো বাড়িতে ভৈরব ঠাকুরের আশ্রম করেছিলেন। এখন বুড়ো হয়ে গেছেন। অতুলই নাকি দেখাশোনা করে। —জ্বরটর সব সেরে যাবে। আমি তোর জন্য ভৈরবঠাকুরকে বলে তারই তৈরি করা একটা ওষুধ এনেছি। এসব তোমাদের হাসপাতালের ডাক্তারখানায় মিলবে না। —যা, ওসব টোটকা ফোটকা করে কিছু হয় না। মাধুরীও রাগ করে। —আরে না, না, ঠাকুর বদ্রিনাথের পাহাড় থেকে সেই কবে একটা আশ্চর্য লতা এনেছিল, হেমছায়া না কী একটা নাম, সব মাটিতে বাঁচে না। অনেক যত্নে দুটি একটি লতা বড় করেছেন। তারই লতাপাতা শেকড় থেকে ওই ওষুধ—পাঁচটা বড়ি বানিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর নিজে, মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন— রোজ একটা করে খাবি, দেখনা, ও হ্যাঁ, একটা সময় ঠিক করে খেতে হবে, যদি আজ দশটায় খাস তো কালকে দশটা কড়ি, পরে দিন দশটা চল্লিশ বুঝলি তো? পারলে কাগজে একটা মন্ত্র লেখা আছে পড়ে নিস। আরে বিশ্বাসে মেলায়ে কেষ্ট, তর্কে বহুদূস। তোর বিজ্ঞান তো কত কী পারে, তবু সব পারে না। এই যে মেঘ বৃষ্টি রামধনু রোদ জোছনা, মরা বাঁচা, এ সবের কোনও মানে নেই? এমনি এমনি হচ্ছে? পারবি একটা ঘাসের ওপর এক ফোঁটা শিশির তৈরি করতে? এ সব টোটকা নয়। খেয়ে দেখ। অন্তত ক্ষতি তো কিছু হবে না।— ওই মন্ত্রতন্ত্র... যেন দুর্বল প্রতিরোধ তৈরি করতে থাকে শুভ। তবে কোত্থেকে কী হয় কে জানে? অসুখে মনও দুর্বল অবুঝ হয়ে পড়ে।

—পারলে মন্ত্র পড়বি, নইলে দরকার নেই। গান শুনলে মন ভালো হয় না? মন্ত্রও তো মনকে শান্তি দেয়। কিভাবে দেয় আমি জানি না, দেয় বৈকি। ভালোবাসাও তো মন্ত্র। ভালোবেসে মানুষ কত কি করে, করতে পারে। জীবনও দেয়। তবে? আর ওই কাগজটার উলটো দিকে একটা ফোন নম্বর আছে। আমার তো ফোন নেই। আশ্রমেও নেই। ওটা ভুবন মাস্টারমশাই-এর। সকালে বা সন্ধ্যেবেলা করে ডেকে দেবে আমাকে। অবিশ্য দরকার হবার কথা নয় তোর। আমিই খোঁজ নেব কিছুদিন পরে। তোর ফোন নম্বর তো আছে আমার কাছে। এবার উঠি। ট্রেন ধরতে হবে। এই যা, ভুলেই গেছি। —ব্যাগ থেকে চারটে গন্ধরাজ লেবু বের করে টেবিলে রাখে, আর রাখে কাগজের একটা প্যাকেটে ওষুধের বাড়ি। আশ্রমের বাগানের লেবু। খাস। —বলেই উঠে দাঁড়ালো অতুল। লিফট নেই, সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হবে। মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকে শুভব্রতর। —একটু চা-টা খেয়ে যাবি না? অতদূর থেকে... ভদ্রতা করতে হবে না তোকে। ল্যাংটাতে ল্যাংচাতে অতুল চলে যায়। মল্লিকা দেখছিল সব। মাধুরীকে বলে দেবে নিশ্চয়। হাসাহাসি করবে। শুভব্রত ওষুধের প্যাকেটটা টেবিল থেকে সরিয়ে লুকোবার চেষ্টা করে। আবার কলিং বেল।

—কে এসেছিল গো? —অতুল। কেশনগর থেকে। সেই ছেলেবেলার বন্ধু। এই দেখো গন্ধরাজ লেবু, আশ্রমের বাগানের। —সিঁড়িতে দেখলাম, খোঁড়া মানুষ। তোমার জ্বর এখন কত? চার্ট দেখতে থাকে মাধুরী। বকবক করলে জ্বর বাড়তে পারে। হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নাও, চা খাও। —জ্বর তো এখুনি পালাচ্ছে না। কাল তো আবার চেকআপও আছে। মাধুরী বাথরুমের দিকে যেতে শুভব্রত ওষুধের প্যাকেটটা খোঁজে। কোনও একটা গোপন জায়গায় রাখতে হবে। মাধুরীকে বলার দরকার নেই। পাঁচদিনের মামলা তো দশ মিনিট করে পেছিয়ে রোজ খাওয়া, মন্ত্র পড়তে পারলে হলো, না হলেও কোনও ক্ষতি নেই। দ্রব্যগুণ যদি থাকে, কাজ যদি হয়, কত অলৌকিকই তো ঘটে! তাছাড়া গাছ গাছড়ার অনেক গুণও তো আছে। ভেষজ বিজ্ঞানও তো ফেলার ওষুধের ডাঁই। সেখানেও নেই। নীচে পড়ে গেল? ঝুঁকে দেখে। না তো। তবে কি বইয়ের তাকে রাখলো? এখান থেকে সে তো ওঠেনি। আশ্চর্য, এত ভুল হচ্ছে এখন। —কী খুঁজছ তুমি? মাধুবী চলে এসেছে।— না, একটা ফোন নম্বর দিয়েছিল অতুল, মানে...। চলো তো চা খাবে

খেন। ম্যাও করে কি শব্দ হলো একটা? —কিসের আওয়াজ? মাধুরী বলল, হাওয়া দিচ্ছে জানালার শব্দ। —বেড়াল নয় তো? —বেড়াল? বেড়াল কোত্থেকে আসবে। মাধুরী একটু বিরক্ত, একটু বিভ্রান্ত, একটা আনমনা। একটা লোক এদ্দিন ধরে শুয়ে বসে কাটাচ্ছে, জ্বরে। অসহায় লাগে। মায়া লাগে।

চায়ের কাপটা শুভ'র হাত থেকে পড়ে যায় মেঝের ওপর। —গরম খুব? হাত কাঁপছে? মল্লিকাও ছুটে আসে। —বেড়াল বোধহয় লাফ দিয়েছে। —বেড়াল? মাধুরী চোখ থেকে চশমা সরায়। ভালো করে শুভ'র চোখে দিকে তাকায়। বুলভাল বকছে না তো? মল্লিকা থার্মোমিটার নিয়ে আসে। টেম্পারেচারটা নোট করে অবার চা করে দিচ্ছি— বলল মাধুরী। থার্মোমিটারটা মুখে দিতে গিয়ে হাত থেকে আচমকাই পড়ে যায়। ভেঙে যায় তৎক্ষণাৎ। কী হলো তোমার? —আমার কিছু হয়নি। হতচ্ছাড়া সেই বেড়ালটা লাভ দিল যে। ওই যে, দেখতে পাচ্ছ? বারান্দার দিকে... মাধুরী আর মল্লিকা দু'জনে চোখে চোখ রাখে। উদ্বেগ, আশঙ্কা। মাধুরী ডক্টর রায়কে ফোন করে। পাওয়া যায় দৈবাৎ। —আমি একটু আসছি। খুব দরকার। একটু গুছিয়ে নিয়ে মাধুরী বেরুতে যায়। মল্লিকাকে নজর রাখতে বলে শুভব্রতর দিকে। রাত হয়ে গেলে ডাক্তারকে পাওয়া মুশকিল। —তুমি চা খাও, আমি এখুনি আসছি। —ডাক্তারের কাছে যাবার দরকার নেই মাধু। আমার মাথা খারাপও হয়নি। —কে বলেছে সে কথা? একটা থার্মোমিটারও কিনে আনতে হবে তো। মাধুরী দরজা খুলতে যায়। এত যে ঝকঝকে আকাশ, হঠাৎ, অত্যন্ত হঠাৎই কালো করে আসে। —ছাতা নিয়ে যাও, শুভব্রত বলে। —টিক বলেছ। মাধুরী ছাতা নিয়ে বেরিয়ে যায়। তার ভিতরে চলছে তোলপাড়। শুভব্রতের চালচলন একবেলার মধ্যে কত বদলে গেছে। ভাবতে ভাবতে পথে নামে, একটা অটোরিক্সা ধরে লেকটাউনের দিকে যেতে হবে।

শুভ টেবিলটা ওলটপালট করে। কোথায় সেই প্যাকেট? পাঁচটা বড়ি, হেমছায়া লতার পাতা রস থেকে তৈরি দৈব কোনও ওষুধ, সেই না-পড়া মন্ত্র, ছোট্ট একটা প্যাকেট। অতুলেরাও তো উয়ায়নের জন্য বিরল প্রজাতি হয়ে যাচ্ছে— ওদের আর পাওয়া যাবে না। কী দায় ছিল ওর, এতটা পথ উজিয়ে, ওষুধ তৈরি করে নিয়ে আসা। সঙ্গে চারটি গন্ধরাজ লেবু। মানে ছেলেবেলা। মানে মায়ের হাতের সেই ডাল, ডালে গন্ধরাজ লেবুর দুর্লভ গন্ধ, হারিয়ে যাচ্ছে এই পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য। আরে, কোথায় গেল সেই প্যাকেট? বই -এর আলমারি তছনছ, আনাচে কানাচে...। পাগলের মতো কী যে খুঁজছে শুভব্রত, কী খুঁজছে, চেহারা দেখেনি যে পাঁচটি জড়ি বুটি বড়ির। কি আছে তাতে? ভৈরব ঠাকুরের মন্ত্রপুত সেই ওষুধ। জ্বরহরণ... মল্লিকা ছুটে আসে, অবাক হয়, এরকম চেহারা দেখে নি সে শুভব্রত'র কখনো। ক্লান্ত বিধ্বস্ত, কপালে ঘাম। মেসোমশাই, এখানে এসে একটু বসুন। আমি খুঁজে দেখছি। —তুমি পাবে না।—আপনি একটু বসুন। বিছানায় এসে বসিয়ে দেয় তাকে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। মেঘ ডাকে। ঝড়ো বাতাস বয়। ওই দেখো, ওই দেখো, —সেই মই। একটা রুপলি মই তেতলার বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে আর সেই সাদা ধবধবে বেনাল উঠে যাচ্ছে মই বেয়ে। ওই দেখো সেই বিড়ালটা— মল্লিকা ছুটে আসে। ঠাঠা করে বাজ পড়ে। বৃষ্টি শুরু হয় তুমুল। আর বিড়ালটা বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে এক মহাজাগতিক লাফে শুভব্রতর ঘরসংসার গোরস্থালি ফেলে উড়াল দেয় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে। মিশে যায় বৃষ্টিতে। —দেখলে দেখলে? মল্লিকা শভব্রতের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সবটাই কি ভুল বকছেন মেসোমশাই... বুঝতে পারে না সে।

।। তিন।।

আর ওদিকে তখন লেকটাউন বইমেলার মাঠে প্রবল ঝড়ো বাতাস মাধুরীর ছোট ভঙ্গুর রঙিন ছাতাটাকে বাঁকিয়ে দুমড়ে তার হাত থেকে ছিনিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকে আকাশের দিকে। একটা অদ্ভুত পাখির মতো সেটা ভেসে যাচ্ছে তখন মেঘের দিকে। অঝোর বৃষ্টিরমধ্যে। মাধুরীর আপাদমস্তক, সমস্ত লোমকূপ দিয়ে ঢুকে পড়তে তাকে অচেনা জীবন। ঝড় বৃষ্টি, বাতাস। ভিতরে আরও ভিতরে। আর একটা ভিজে বেড়াল টানছে তার আঁচল ধরে।